SYNOPSIS OF THE PROPPSED THESIS

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

RABINDRA-UPANAYASER NARI MONER DWANDWA BINAYAS

Supervision
Dr. Jayati Bhattacharya
Assistant Professor
Dept. of Bengali
Ranchi Women's College
Ranchi, Jharkhand

Researcher
Chanchal Mondal
M.A., M.Phil.

University Dept. Of Bengali
Ranchi University
Ranchi, Jharkhand

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

ভূমিকা

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার?
হে বিধাতা...।"

বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের সমস্ত দিকে তিনি বিচরণ করেছিলেন। আপন প্রতিভার বলে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের সীমায় পৌঁছে ছিলেন, তায় বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি বরণীয় ও স্মরণীয়। বিষয়ভেদে, স্থানভেদে, কালভেদে রবীন্দ্র সাহিত্য বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়, হৃদয়গ্রাসী ও দৃষ্টিনন্দন। এক কথায় বাংলা সাহিত্যের 'রা' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সৃষ্ট দার্শনিক চিন্তা চেতন, লেখা, গান, সুর, উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, ছন্দ, ভৈব্যজ্ঞান, সাদরে গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ উত্তরসূরির ভীতকে প্রশস্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। 'বউ ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসাশ্রিত। এইগুলিতে বঙ্কিমীচাল লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তী উপন্যাসগুলির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এবং সার্থক লেখনশৈলী দেখাতেও সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী উপন্যাসগুলি হল 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ', 'দুইবোন', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'চারঅধ্যায়', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা', 'শেষের কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'মালঞ্চ', 'চোখের বালি'।

সমাজ জীবনে দৈনন্দিন জটিলতা বেড়েই চলেছে। মানুষের জীবনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্ত নেই। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে ও বিশেষ করে নারী মনের দ্বন্দ্বের অন্তরায় কোথায় তা বের করতে রবীন্দ্র উপন্যাস থেকে একটি গবেষণা সন্দর্ভ নির্মাণ করা যেতে পারে, যা নিয়ে পূর্বে কোনো কাজ হয়নি। তাই 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস' নামক গবেষণা সন্দর্ভটির নাম দেওয়া যেতে পারে।

দ্বন্দ্বের বিন্যাস প্রকরণ ও বিচিত্রগামিতা সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা দেওয়া যেতে পারে। প্রাক্-রবীন্দ্র উপন্যাসের, ঐতিহাসিক উপন্যাসের, পারিবারিক সামাজিক উপন্যাসের, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের, রোমান্টিক উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস। এই ভাবে সাজানো যেতে পারে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বন্দ্ব, মা-মেয়ের দ্বন্দ্ব, ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব,

পিতা-কন্যার দ্বন্দ্ব, এছাড়াও পরিবারের ও সমাজের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিচিত্রগামিতা লক্ষ্য করা যায়।

স্থানভেদে, কালভেদে ও বিষয়ভেদে নারীর মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন ভাবে ধরা পড়েছে। যদি পূর্বকার কথা ভাবী তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল যেমন রাধে, কনতেয়ার, গঙ্গাপুত্র, যশোদা নন্দন, গান্ধারী নন্দন ইত্যাদি। সেই সময় নারীর পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। আবার দেখি কোনো সময় নারী পুরুষের অধীনস্থ জীবনকে অনেক সুরক্ষিত বলে মনে করেছে। সীতার মতো তাদের গণ্ডি পেরোতেও ভয় লাগত। পুরুষশাসিত সমাজে নারী ছিল অনেক দুর্বল ও অসহায়। শিক্ষার হার ছিলনা বললেই চলত। পদে পদে বিপদ তাদের জড়িয়ে ধরত। রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়া পর রাঁধা এই ছিল তাদের জীবন। পুরুষের আরামের ও দৃষ্টিনন্দনের ভোগ্য পণ্য স্বরূপ ছিল নারী। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম দানেই ছিল তাদের জীবনের সার্থকতা। নবজাগরণের সময় নারীশিক্ষার প্রচার ও নারীমুক্তির দিকটি নিদর্শন করা হয়। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে ও আধুনিকতাদানে নারীর প্রগতির পথকে প্রশস্ত করে। শিক্ষা ও রক্ষণশীলতার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারী জাতিকে পুরুষের সমকক্ষরূপে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কখনও কখনও দেখি নারীর দুর্বলতা নারীকে রহস্যময় করে তুলেছে। যেমন বৃক্ষকে বেজিয়ে লতা বেড়ে উঠে। একটির অস্তিত্ব শেষ হলে অন্যটিও অস্তিত্ব হারায়। এছাড়াও পুরুষশাসিত সমাজে নারী তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে ছলনা, কৌশল, বাকচাতুরতা অবশেষে কান্নাকে ঢাল বানিয়ে জীবনকে স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই নারীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদেরকে নিজেদের অধিকার বুঝেনিতে শিখিয়েছে। পুরুষের সঙ্গে তাল মেলাতে শিখিয়েছে। তাদের শিরদাঁড়া প্রতিস্থাপন করে সমাজে উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে। যে নারী রাঁধে সে চুলও বাঁধে। অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মান যে অনেক উন্নত, সে তার পরিচয় দিতে শিখেছে।

প্রাক্ রবীন্দ্র-উপন্যাসে ও রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীর মানসিক সংঘর্ষ থেকে বেড়িয়ে মনের এক অভিনব বন্ধন ও দ্বন্দ্বের মধ্যকার মনোভাব কিছুটা এই রকম—বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের মধ্যে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের ছবিতে লাথি মারার কারণকে ঘিরে যে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা হয়েছে, সেখানে চঞ্চলকুমারী ও তার সাথীরা মিলে ঔরঙ্গজেবের ছবিতে লাথি মারে। এই কথা রাজার কাছে গিয়ে পৌঁছায়, তখন রাজা তার প্রতিশোধ নিতে চঞ্চলকুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। চঞ্চলকুমারী তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হিন্দু মেয়েদের মধ্যে একটা জাতপাতের আধিক্য ছিল। তার হাত থেকে নিস্তার পেতে অনন্ত মিশ্রের হাতে রাজসিংহকে চিঠি পাঠায়। রাজসিংহ তার কথার মান রাখে এবং রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে চঞ্চলকুমারীকে

বিবাহ করে। এছাড়া কতগুলি উপকাহিনীর মধ্যে নারী চরিত্র আছে যেমন, নির্মলকুমারী, দরিয়া বিবি, জেব-উন্নিসা, যোধপুরী, উদিপুরী প্রতিটি নারীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে উপন্যাসে কাহিনীর অবতারণাতে। বিষবৃক্ষ উপন্যাস দেখি সূর্যমুখী নগেন্দ্রের স্ত্রী। তাদের সুখের জীবনে কুন্দনন্দিনী এসেছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরের দূরত্ব বেড়েছে, এবং পরে কুন্দ মারা যাওয়ার ফলে পুনরায় তাদের মেল হয়েছে। এছাড়াও হীরা নামক স্ত্রী চরিত্রটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে দেখি ভ্রমর ও গোবিন্দলালের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুব ভাল। হরলাল রোহিণীর মনে যে কামনার আগুন জ্বেলেছিল তার অন্তরদহন হয়েছে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের সম্পর্কের টানাপড়েন নিয়ে। শেষে ভ্রমরও মরেছে রোহিণীও মরেছে, এবং গোবিন্দলাল দেশান্তরি হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেশী গ্রাম্যনারীদের কথাবার্তার কিছু গুরুত্ব আছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলিতে যে নারী অন্তরমানসের কথা পাই তা বউ ঠাকুরানীর হাটে সরমা ও রুক্মিণীর অন্তরদ্বন্দ্ব এবং বিভার চিত্তবিহ্বলের কাহিনী। রাজর্ষি উপন্যাসে একটি মেয়ের কথা ও নৈপথ্যে একটি রাজকুমারীর চিঠিতে মনের দ্বন্দ্বের কথা পাই। বিশেষ নারী দ্বন্দ্ব রাজর্ষিতে নেই। নৌকাডুবিতে হেমনলিনী ও কমলার অন্তরদ্বন্দ্বের কাহিনী বিন্যাস দেখি। ("সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্যতাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।" এখানে কুমুদিনী দক্ষ গৃহকর্ত্রী ও দক্ষ স্ত্রী হয়ে ওঠার বাসনা কে বুঝায়) যোগাযোগে কুমুদিনী, শ্যামাসুন্দরী ও নিস্তারিণীর প্রভৃতি নারী মনের গল্প পাই। দুইবোনে শর্মিলার ও উর্মিমালার গৃহস্থজীবনের মানসদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। প্রজাপতির নির্বন্ধে অক্ষয়বাবু তার শ্যালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এখানে পুরবালা, শৈলজা, নৃপবালা ও নীরবালার মানস কল্পনাকে তুলে ধরা হয়েছে। করুণাতে করুণা, মোহিনী, রজনী প্রভৃতি নারীদের কথা। চারঅধ্যায়ে পাই এলা, মাধবী ইত্যাদি নারী দ্বন্দ্বের কথা। ঘরে বাইরে পাই বিমলার আত্মকাহিনী। গোরাতে আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, লাবণ্য, লীলা, ললিতা, সুচরিতা বিভিন্ন নারী মনের দ্বন্দ্বের কথা। শেষের কবিতাতে লাবণ্য, কেতকীর। চতুরঙ্গে দামিনীর কথা। মালঞ্চে নীরজা ও সরলার কথা। এবং ("আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।" নারী কর্মদক্ষতার পরিচয় বিনোদিনীর এই কথার মাধ্যমে জানা যায়।) চোখের বালিতে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, আশালতা, বিনোদিনীর নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস আমার আলোচ্য বিষয়। 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস' পরিকল্পিত গবেষণা পত্রটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হবে—

প্রথম অধ্যায় : *প্রাক্ রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।*

দ্বিতীয় অধ্যায় : *ঐতিহাসিক রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।*

তৃতীয় অধ্যায় : *পারিবারিক সামাজিক রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।*

চতুর্থ অধ্যায় : *মহাকাব্যধর্মী রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।*

পঞ্চম অধ্যায় : *রোমান্টিক রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।*

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি :

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্ রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

প্রাক্ রবীন্দ্র-উপন্যাস বলতে রবীন্দ্র পূর্ববর্তী লেখকের উপন্যাস কে বোঝায়। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বিভিন্ন লেখক থাকলেও আমার বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার জড়তার মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষাকে আধুনিকত্ব দানে তাঁর বিশেষ অবদান আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। শুধুমাত্র বাঙালি কেন সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী। উনিশতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল নবজাগরণের সময়। এতদিন বাঙালি সমাজ যা ভেবে এসেছিল তা প্রথম বার ধাক্কা খাচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শিক্ষায় স্নাতক ছিলেন এবং তাঁর লেখার মধ্যে সেই প্রবণতাটি ফুটে উঠতে দেখলাম। এই নবজাগরণের একটি অন্যতম স্তম্ভ হল নারীজাগরণ। সেই নারী জাগরণের বার্তাটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নারী ভাবনামূলক বিভিন্ন লেখা আমরা দেখি। এমনকি বঙ্কিমের অর্ধেকেরও বেশি উপন্যাসের নাম 'নারীর' নাম নিয়ে। যেমন, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দেবী চৌধুরাণী, রজনী, ইন্দিরা, রাধারাণী ইত্যাদি। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য নারীরা হল দুর্গেশনন্দিনী, আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ইত্যাদি। সেই সময়ে কথার প্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বিবাহের পর বলছেন—

"যদি জানিতাম স্ত্রী লোকের বিবাহ দাসীত্ব, কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

এই যে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তিনি রাখলেন এটাই কিন্তু নবজাগরণের ফলশ্রুতি। 'চন্দশেখর' উপন্যাসে দেখি এখানে মূল আকর্ষণ কিন্তু চন্দ্রশেখর নয়, শৈবালিনী। তার বুদ্ধিমত্তায় তাকে অধিকত্বর শ্রীময়ী করে তুলেছে। 'সীতারাম' উপন্যাসে 'জয়ন্তী' বলেছে 'শ্রী' কে—

"ধীরে যাগো বহিন, একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্টকে ছাড়াইয়া
যাইতে পারবি?"

কি এক অসাধারণ কথা। সত্যই যদি ছুটে যায় তাহলে কি অদৃষ্টকে পরিবর্তন করতে পারবে। যেটা আমাদের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে লিপ্ত হয়ে থাকে, সেটাকে কখনো পরিবর্তন করা যায় না। তার অঙ্গুলিহেলন ও চোখ রাঙানি থেকে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে শান্তি কে দেখি পুরুষের সাজানো বেড়া ভেঙে পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে। কল্যাণী ও নিমির কথা

পাই। ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে প্রফুল্লকে এক দস্যুরাণী হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যে নারী ইংরেজদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাসগুলি আমার মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটে অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। এবং বিচিত্রগামিতা ও মনস্তত্ত্বের বিশেষ প্রকাশ ফুটে উঠেছে সেইগুলি হল— ‘রাজসিংহ’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’। এই উপন্যাসগুলি নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল

রাজসিংহ:

এই উপন্যাসটির পূর্বনাম ছিল ‘ক্ষুদ্রকথা’। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসটিতে নারী চরিত্রগুলি পুরুষ চরিত্রগুলিকে নাচিয়ে মেরেছে। মূলত নারী চরিত্রগুলি কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

> “আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি, সবাই
> ইহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক
> ভাঙ্গে দেখি।”

এই একটি মাত্র কথাতে এই উপন্যাসের কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাশ টেনেছে। ততকালিন সময়ে এ এক অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। বাদশাহের ছবিতে লাথি মেরেছে চঞ্চলকুমারী ও তার সখীগণ। এই খবর গিয়ে পৌছায় ঔরঙ্গজেবের কানে। তিনি তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চঞ্চলকুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রাজকুমারী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

> “তুই কি মনে করেছিস যে, আমি দিল্লীতে গিয়ে মুসলমান বানরের
> শয্যায় শয়ণ করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?”

এটি চঞ্চলকুমারীর উক্তি। তৎকালীন সময়ে মুসলমান নবাবরা যে কোনো জাতির নারী কে বিবাহ করত। কিন্তু হিন্দুরা ছিল তার বিপরীত। রাজকুমারী রাজসিংহকে চিঠি লেখেন। রাজসিংহ রাজকুমারীকে সাহায্য করে, এবং যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করে তাকে বিবাহ করে।

এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলি হল যোধপুরী, উদিপুরী, জেব উন্নিসা, দরিয়া বিবি, নির্মলকুমারী। এই প্রত্যেকটি চরিত্র এক একদিকে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে এই উপন্যাসে। এই নারীচরিত্রগুলি মধ্যে বিচিত্রগামিতা, নারী মনস্তত্ত্ব ও মানসিক সংঘর্ষ প্রবল। এখানে নারী চরিত্রগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে, পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের কথা অনুসরণ করেছে। এই উপন্যাসে নারী চরিত্রের এক বিস্ময়কর বিপ্লব দেখা গেছে।

বিষবৃক্ষ :

এই উপন্যাসে বিধবা বিবাহের কুফল তুলে ধরা ও ব্রহ্মসমাজের উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনের সামাজিক রূপ নির্মাণ বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও পুরুষের দুর্বল হৃদয়ের পরাজয় এবং পতন থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা। এই উপন্যাসটিকে মূলত নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত করে তুলেছে। এখানে প্রথমে দেখি নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনে কুন্দনন্দিনীর প্রবেশে তাদের সাংসারিক জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সূর্যমুখী স্বামী নগেন্দ্রের বিবাহ দিয়েছে ও নিজে গৃহত্যাগ করেছে। এখানে এই নারী চরিত্রটি এক স্থান অর্জন করছে। তার স্বামীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, নারীও পারে তার আত্মসম্মান রক্ষা করতে। আবার নগেন্দ্র তার ভুল বুঝতে পারে তখন কুন্দ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। যখন নগেন্দ্র কুন্দকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি দোষে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো? তখন কুন্দ জবাব দেয়—

> “কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকট এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না।”

এখানে নারী মনের একটা অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। অপর একটি নারী চরিত্র পাই ‘হীরা’ নামে সে বাল্যবিধবা, নগেন্দ্রের দাসী। সে ছিল সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে নিপুণ। তার মনে কামনার বীজ বপন করেছে দেবেন্দ্র। সে তাকে কেবল ব্যবহার করেছে। তাই তার প্রতিশোধ নিতে হীরা কুন্দকে নির্যাতন করেছে। কারণ দেবেন্দ্র কুন্দের প্রতি আসক্ত ছিল। তাই দেবেন্দ্রকে কষ্ট দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ভেবেছে—

> “এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সে ইহা খাইবে, নহিলে তার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।”

পরে কুন্দকে সে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে। এখানে এই ‘হীরা’ চরিত্রটি বিদ্রোহী, প্রতিবাদী, জীবনের মায়াত্যাগী, রহস্যময়ী নারী রূপ লাভ করেছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল:

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনস্তত্ত্বের সুগূঢ় ভাবনাকে এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির চেয়েও সমাজ একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এবং সামাজিক কানাঘুষা চরিত্রগুলির পতনের কারণ হয়েছে। এমনকি নারী চরিত্রের প্রতিভার জোরে পুরুষ চরিত্রগুলির প্রাণ

প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং উপন্যাসের কাহিনীকে নারী কর্তৃক পরিচালিত করা হয়েছে। নরনারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতা কে কেন্দ্র করে একটি সুখী পরিবার ধ্বংস হয়েছে, তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণকান্তের 'উইল' টি। এটি কে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার ও সমাপ্তি হয়েছে। সময়ভেদে ও বিষয়ভেদে তার বারবার পরিবর্তন হয়েছে। এবং এই পরিবর্তনের ফলেই যত অশান্তি ঘটেছে।

> "তুমি মনে জান বোধ হয়, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।"

এই উক্তিটি বঙ্কিমবাবু ভ্রমরের মধ্য দিয়ে অবতারণা করেছে। তখনকার সময় স্ত্রীর স্থান পুরুষের শ্রীচরণে, সেই জায়গাই এই উক্তিটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে নারী তার নারীত্বকে তার আত্মসম্মানকে রক্ষা করেছে। এবং পুরুষ শাসিত সমাজের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে। ভ্রমরের মনস্তত্ত্বের দিকটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়া এখানে দেখা গেছে রোহিণীর মনের সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব। বঙ্কিমবাবু এখানে নারী মনের দোদুল্যমান মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা বললে ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি ’ উপন্যাসের কথা উল্লেখ্য। এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমীচাল লক্ষ্য করা গেছে। ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসটিতে নারী মনের দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটিতে নারী চরিত্রের সে রকম দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না।

বউ ঠাকুরানীর হাট:

এই উপন্যাসটিতে যশোরের রাজা প্রতাপদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নারীর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

> “সুরমা কহিলেন— প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো,
> একদিন না একদিন সুখের দিন আসিবে।”

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে সুরমার ধৈর্য শক্তির ও সহ্যশক্তির কথা বলা হয়েছে। এবং তার স্বামীকে অসময়ে সুপরামর্শ দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দেখাচ্ছে। আবারও সুরমা কিছু কিছু জায়গাই ভুল করেছিল ও ভুল মানুষকে বিশ্বাস করেছিল। যার কারণে তাকে মরতে হয়েছিল।

> “সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র ; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও
> লঙ্ঘন করে।”

এখানে উদয়াদিত্যের জীবনের নানা টানাপড়েন লক্ষ্য করা গেছে। তাকে কেন্দ্র করে রুক্মিণীও সুরমার জীবনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া উদয়াদিত্যের বোন বিভার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বিভার পিতা রামচন্দ্রের মৃত্যুর আদেশ দিলে, সে কোনো রকম প্রাণে বাঁচে। এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর কোনোদিন ফিরে না। রামচন্দ্র যখন পুনরায় বিবাহ করার আয়োজন করে, তখন সেখানে উদয়াদিত্য ও বিভা পৌছায়। তখন তাদের কে রামচন্দ্র অপমানিত করে তাড়িয়ে দেয়। তখন তারা দুই ভাইবোনে কাশী যাত্রা করে।

রাজর্ষি:

এই উপন্যাসটিতে তেমন ভাবে কোনো নারী চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়নি। রাজা গোবিন্দমানিক্যের কথা, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কথা, গোমতী নদীর কথা ও এক ধরনের প্রথার কথা উল্লেখ হয়েছে। হাসি বলে বালিকাটি রাজাকে পিতা বলে সম্বোধন করত। একদিন হাসি রাজাকে জিজ্ঞাসা করল—

> "এ কিসের দাগ বাবা?
> রাজা বলিলেন, রক্তের দাগ, মা।
> সে কহিল, এত রক্ত কেন?"

এই মাত্র কথাতে রাজার মনের পরিবর্তন হল। বলিপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এর ফলে ব্রাহ্মণ রঘুপতির সঙ্গে বিবাদ বাঁধে। পরে প্রথার হার প্রেমের জয় হয়।

আর একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা হয়। সেখানে ঔরঙ্গজীবের পুত্র কুমার মহম্মদকে সুজার কন্যা লিখেছেন—

> "কুমার এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল; যাহাকে মনে মনে স্বামী রূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরী বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে, আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন, এই কি আমাকে দেখিতে হইল।"

এখানে আমরা এক বিদ্রোহী নারীর সপাটে জবাব লক্ষ্য করি। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিবাদী নারী দেখা যায় না বললেই চলে। এখানে নারীর আত্মসম্মানকে বাঁচাতে তিনি প্রেমিক পুরুষকে চিঠি লিখেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক সামাজিক উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট পারিবারিক সামাজিক উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্বকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন নৌকাডুবির কমলার মধ্যে স্বামী নামক আইডিয়া প্রধান ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে হেমনলিনী তার শিক্ষা, দিক্ষার, জ্ঞান গরিমায় একজন দীপ্তিময়ী নারী। তার নারীত্ব রমেশের পরিস্থিতিকে সমান ভাবে বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করেছে। এবং পরে রমেশকে ক্ষমা করেছে। যোগাযোগে পাই একজন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামী নামক দেবতাকে, নিজেকে অর্পণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের ধনজ অহংকার, সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। পরে কুমুদিনী মাতৃত্বের টানে পুনরায় মধুসূদনকে সমর্পণ করেছে। এছাড়াও নিস্তারিণী ও শ্যামাসুন্দরীর অন্তরের নারী ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছে। দুই বোনে দেখি সেখানে দুই বোনের অন্তর মানসের দ্বন্দ্ব। প্রজাপতির নির্বন্ধে পাই, সেখানে অক্ষয়বাবুর কৌশলে তার শ্যালিকাদের বিবাহ দেওয়ার ঘটনা। এবং নীরবালা, নৃপবালা, শৈলজা বিভিন্ন নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস। করুণাতে পাই এক সহজ সরল নারী অসৎ পাত্রে পড়ায়, তার জীবনের নানা দুর্গতির ও অন্তর ভাবনার কথা। চারঅধ্যায়ে দেখি এলা নামক একটি দীব্যময়ী জ্ঞানী নারীমূর্তি। ভালোবাসা ও দেশপ্রেম জনিত কারণে নারীর অন্তরদ্বন্দ্ব। আর ঘরে বাইরে বিমলা চরিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। যখন তার ভুল ভাঙে তখন স্বামীকেই সে শ্রেষ্ঠ মনে করে নিখিলেশের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

নৌকাডুবি :

নৌকাডুবি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রেম অপেক্ষা কর্তব্যকে অধিক করে দেখিয়েছেন। হেমনলিনীকে রমেশ ভলোবাসা সত্ত্বেও সে পিতার কথার মান রাখতে সুশীলাকে বিবাহ করেছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুশীলার জায়গাতে কমলাকে পেয়েছে। কমলার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় সেই প্রেমকেও প্রত্যাখ্যান করে নলিনাক্ষের হাতে অর্পণ করেছে কমলাকে। পুনরায় হেমনলিনীর সানিধ্যলাভ করেছে রমেশ। অর্থাৎ তৎকালীন নারীরা স্বামীর প্রেমের চেয়েও স্বামী নামক আইডিয়াকে অধিকত্বর গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে একদিকে কমলার মনের নানাবিধ ভাবনা আন্দোলিত করলেও, সে কখনো জোর করে রমেশকে পেতে আগ্রহী হয়নি। আবার হেমনলিনীও অন্তরদ্বন্দ্বে পীড়িত হলেও সেও পরিশেষে রমেশকেই ভালোবেসেছে।

যোগাযোগ:

“এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভেতরে আলো।’ মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহি।” কুমুদিনী মধুসূদনের পত্নী। কুমুদিনী নিজের স্বপ্নকে সাজিয়ে মধুসূদনের পূজার অর্ঘ্য হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের দাম্ভিক অহংকারের ফলে কুমুর স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। কুমুর মন আর মধুসূদনের প্রতি প্রীতিকর নয়। তা সত্ত্বেও তাকে মধুসূদনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে হয়েছে। আবার কুমুও মধুসূদনের বিচ্ছেদের সুযোগে শ্যামাসুন্দরী সেই জায়গা দখল করার চেষ্টা করেছে। পুনরায় মাতৃত্বের টানে কুমুকে ঘোষাল বাড়িতে ফিরতে হয়েছে।

দুইবোন:

> “দিদি এসে বললে, “তুই যেতে পারবিনে।”
> “সে কী কথা।”
> “হিন্দুসমাজে বোন সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করেনি।”
> লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো লোকের মুখের কথা।”

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে এক গৃহস্থ ঘরে অন্তদ্বন্দ্বের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। শশাঙ্ক, শর্মিলা, ঊর্মিমালার মনস্তত্ত্ব বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। শর্মিলার শরীরে রোগ ধরলে তার বোন ঊর্মিমালাকে আনা হয় তাদের বাড়িতে। কিছুদিন যাওয়ার পর সংসারে অশান্তি বাঁধে। এবং শেষে ঊর্মিমালা ডাক্তারি শেখার জন্য বিদেশ যাত্রা করে। এছাড়াও ঊর্মির বিয়ের পাকা কথা হয়েছিল। কিন্তু নিরদ তা অস্বীকার করে বিদেশে পাড়ি দেয়। এখানে ক্ষেত্র বিশেষে নারী মনের বিভিন্ন অন্তরদ্বন্দ্বের কাহিনী পরিস্ফুটিত হয়েছে।

প্রজাপতির নির্বন্ধ :

এই উপন্যাসটি হাস্যরসে পরিপূর্ণ। অক্ষয় বাবুর শ্যালিকাদের বিবাহের জন্য তিনি কৌশল করে কুমারদের ব্রতভঙ্গ করেন। এবং জগত্তারিণী, পুরবালা, শৈলজা, নীরবালা, নৃপবালা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলির উপস্থাপনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাদের প্রতিটি চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে তিনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছলে বলে কৌশলে নৃপবালা, নীরবালা চিরকুমার সভার সভ্যদের ব্রতভঙ্গ করেছেন।

করুণা:

এই উপন্যাসে তৎকালীন বাবুকালচার লক্ষ্য করা গেছে। মহেন্দ্র ও নরেন্দ্র কলকাতার আধুনিক শিক্ষার বিপাকে পড়ে মদ্যপান ও নারী মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে সঙ্গে গোটা যুবসমাজ। সংসারে নেমে এসেছে অন্ধকার, সমাজ চলেছে ধ্বংসের পথে। অনুপবাবু একজন ভদ্র মানুষ। তিনি তার যৌবন কালে প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করে সঠিক ব্যবহার করেছেন। একটি দুঃখ ছিল, মেয়েকে সৎপাত্রে দান। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তার কাছে তার পুত্রকে নরেন্দ্রকে দিয়ে যান। পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে করুণার বিবাহ হয়। নরেন্দ্র বিপথে যাওয়ায় সংসারের অধঃপতন হয়। মোহিনী নামক বিধবার সঙ্গে কখনো মহেন্দ্র আবার কখনো নরেন্দ্রের দুটানা ভাবনা লক্ষ্য হয়েছে। রজনী ও মহেন্দ্রের সম্পর্কের অবসাদ দেখা দিয়েছে। এছাড়াও স্বরূপ নামক চরিত্রের করুণার প্রতি দুর্বলতা দেখা গেছে। নিধি নামক নারী চরিত্রের মুখরা চিত্র ফুটে উঠে। পরিশেষে মোহিনী কাশীবাসী হয়েছে, তার অন্তরজ্বালা শান্ত করার জন্য। রজনী ও মহেন্দ্রের পুনরায় মিলন হয়েছে। করুণা অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে অসৎ স্বামীর পাল্লায় পড়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়েছে।

চার অধ্যায় :

রবীন্দ্রনাথের এটি মেকি রাজনৈতিক সমালোচনা মূলক সামাজিক উপন্যাস। যেখানে তৎকালীন সমাজের কিছু অযৌক্তিক নেশার মোহে নরনারীর আত্মবলীর কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছে। নরেশ ও মায়াময়ীর কন্যা হল এলা। তিনি ছিলেন দেখতে সুন্দরী ও গুণবতী। মায়াময়ীর নরেশের দ্বন্দ্বে মায়াময়ী নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে, এতে ছিল এলার মনবিরোধ। এলার বাবা ও মার মৃত্যুর পর তার কাকা সুরেশের গৃহে তার অবস্থান হয়। মাধবী ছিল তার কাকিমা। তার কাকিমা চেয়ে ছিল এলার বিয়ে দিতে। কিন্তু এলা তা করতে রাজী নয়। পরে ইন্দ্রনাথের কাছে নারায়ণী স্কুলের ভার নেয়। অন্তুর সঙ্গে নানাভাবে প্রেমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও মানসিক টানাপড়েন লক্ষ্য হয়।

> "ওর ড্যাবা চোখ দুটো দুর থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার
> অপমান করে।"

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের কিছু ভ্রষ্ট পুরুষের চিত্র মানসিকতা তুলে ধরেছে। অবশেষে দেখি এলার মৃত্যু ও অন্তুর জেল হয়েছে। রাজনীতির বিপাকে পড়ে দুটি তরতাজা প্রাণের বলি হয়েছে।

ঘরে বাইরে :

রবীন্দ্রনাথের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত উপন্যাস হল 'ঘরে বাইরে'। এই উপন্যাসে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব, স্বদেশী আন্দোলনের ছাপ লক্ষ্য হয়। এছাড়াও নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলার মনস্তত্ত্বের দিকটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও বিমলার নারী মনের অন্তর দ্বন্দ্বের দিক লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের প্রথম দেখি নিখিলেশের দুই ভাই মদ্যপান করে অকালে মারা গেছে। বাড়িতে দুই বৌদির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিখিলেশের। নিখিলেশের দিদি তার বৌ বিমলাকে পছন্দ করে বাড়িতে আনে। নিখিলেশ বিমলাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চায়, তাই সে একজন ইংরেজ শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। তা নিয়ে মেজরাণী উপহাস করে। বড়রাণীকে ঠাকুরের উপসনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এই রকম নানা খুনসুটির মধ্যে বিমলা ও নিখিলেশের বিবাহিত জীবন পার হয় নয় বছর। এরপর একদিন দেখি নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ আসে তার বাড়িতে। বিমলা তাকে নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে চান। সন্দীপ ও তার মান রাখে। এরপর সন্দীপের প্ররোচনায় বিমলা নিজেকে মক্ষীরানী মনে করে। বড় নেতা ভাবতে থাকে। এবং নিখিলেশের সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। নিখিলেশ তাকে ছুটি দেওয়ার কথা বলেছে। তখন বিমলার মনে হয়েছে—

> "ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়। ছুটি কি একটা জিনিস। ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি; হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি' তখন দেখি এখানে আমি চলতে পারিনে, বাঁচতেও পারিনে।"

তখন শোবার ঘরে গিয়ে দেখি আসবাব, আলনা, আয়না, খাট সেই সর্বব্যাপী হায়টি নেই। কেবল আছে ছুটি আর ফাঁকা, ঝর্ণা একেবারে শুকিয়ে নুড়ি বার হয়ে গেছে। আবার অন্য দিকে সন্দীপের প্রতি তার মনে হয়েছে—

> "তুমি আমার ধর্ম, তুমি আমার স্বর্গ, আমার যা কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরম্।"

এখানে বিমলা চরিত্রের মনের দ্বন্দ্বের অন্তরায় যে কি তা বুঝা কঠিন। পরে সন্দীপের চরিত্র বিমলার কাছে পরিষ্কার হয় এবং বিমলা স্বামী নিখিলেশের প্রতি পুনরায় অনুরাগ প্রকাশ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরা। এই উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন নানা দিক। কংগ্রেসের মতে অমিলে দুই ভাগে বিভক্ত হয় নরমপন্থি ও চরমপন্থি। বিদেশী ও স্বদেশী আন্দোলন, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের দ্বন্দ্ব ও নারী মুক্তির কথা বলেছে। এই উপন্যাসটি বিংশ শতকের ছেলে মেয়েদের বাঁচার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে ছিল। এটি রবীন্দ্রনাথের সর্ববৃহৎ উপন্যাস। এর মধ্যে সমস্ত কিছুর প্রতিফলন ঘটে। এছাড়াও নারী মনের বিন্যাস তিনি সুনিপুণ ভাবে ভাষাশৈলী ও লেখনীর যাদুস্পর্শে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গোরা :

এই উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ নারী চরিত্র গুলি হল, আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী, সুচরিতা, লাবণ্য, ললিতা, লীলা, হরিমোহিনী। প্রথমে আমরা আনন্দময়ীকে নিয়ে কথা বলব। আনন্দময়ী এমন এক নারী মূর্তি যার মধ্যে জাতপাত কিছু নেই। সর্বত্র তার অগাধ যাত্রা। সকল কে সে আপন করতে জানে। তার মধ্যে গোরা প্রথম বিশ্ব ভাবনাকে ও মানব ভাবনাকে লক্ষ্য করেছে। এবং আনন্দময়ীকে বলেছে তুমি আমার ভারতবর্ষ। বরদাসুন্দরী পরেশবাবুর স্ত্রী। ব্রহ্ম সমাজের অন্তর্গত একজন আল্ট্রামর্ডাণ নারী। তার মধ্যে আজ একদিকে সামাজিক শ্রী লাভের বাসনা, অন্যদিকে আছে গৃহের কৃপণ ও স্বতন্ত্র নারী ভাবনা। সুচরিতা পরেশবাবুর আশ্রিতা মেয়ে। তার বন্ধু মারা যাওয়ার সময় তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এবং পরেশবাবুতাদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলে। সুচরিতা হলেন এই উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র।

> "চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদবেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমন সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।"

সুচরিতা গোরাকে মনে মনে ভালোবেসেছিল৷ তাই তার সঙ্গ আনন্দের ও তার বিচ্ছেদ, ব্যথাময় হয়েছে৷ এবং গোরা যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণে বের হয়, তখন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে গোরা চলে যায়৷ তাই সুচরিতার ক্ষোভে দুঃখ্যে বুক ফেটে যেতে চাই৷ এবং মনে মনে গোরাকে ধিক্কার জানাতে থাকে৷ এবং মনে মনে পানুবাবুকে বিবাহ করিব ভেবে, ব্রহ্মসমাজের কাজে যোগ দেবার কথা ভেবে মনকে প্রস্তুত করেছে৷ কিন্তু যখন হারাণবাবু সুচরিতাকে বলে তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, তখন সে বিবাহের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে৷ এবং পরে গোরার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে৷ এখানে চরিত্রটি বহুমাত্রিক ও রহস্যময় হয়ে উঠে৷ এছাড়াও লাবণ্য, ললিতা, লীলা পরেশবাবুর কন্যা৷ তাদের মধ্যে ললিতাকে সুচরিতার ছায়াসঙ্গী হিসাবে দেখা গেছে এবং বিনয়ের সঙ্গে ললিতার সম্পর্কে নানা দিক লক্ষ্য করা যায়৷ হরিমোহিনীর মধ্যে একটি গ্রাম্যকুসংস্কার যুক্ত বৃদ্ধ রমণীর ছবি লক্ষ্য করি৷ তার মধ্যে কুটিল মনের ভাবনা ও নিজ স্বার্থ বুঝে সে পথ চলে, তার সংলাপেই তা প্রমাণ করে৷ রবীন্দ্রনাথ এই হরিমোহিনী চরিত্রটি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন৷

পঞ্চম অধ্যায়

রোমান্টিক রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চির রোমান্টিক এবং তাঁর উপন্যাসগুলিতে রোমান্টিক ভাবনাই বেশি ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসগুলিতে লক্ষ্য হয়েছে, লেখার চিন্তন ও চেতন ছিল অন্তর্মূখী ও ছায়াময়। ভাববস্তু অর্ধস্ফুট, আবেগমণ্ডিত, ব্যঞ্জনাধর্মী, ঐন্দ্রজালিকা শক্তি এবং কল্পনা শক্তিতে পরিপূর্ণ। এই রকম মনভাবনাশ্রিত উপন্যাস হল—

শেষের কবিতা :

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’ও এটি তাঁর কালজয়ী অমর সৃষ্টি। এই উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোড়ামি সব কিছুর উপর প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেমকে দেখানো হয়েছে। বাস্তবচেতনা বোধে এই উপন্যাসটি ছিল অপরিহার্য। নব শিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবন কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

যোগমায়ার একটি কথায় লাবণ্যের মনের রহস্যকে ভেদ করেছে—

> “যদি না ভালোবাস, ওকে স্পষ্ট করেই বল না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে
> যদি না চাও তবে, ওকে ধরে রেখ না।”

এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু দিকে দেখি বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার অমিত রায় শিলং ঘুরতে যায়। এবং সেখানে যাওয়ার সময় মোটর দুর্ঘটনায় পরিচয় হয় লাবণ্যের সঙ্গে। এবং সেখানে তাদের প্রেমের কথা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তখন তাদের মাঝখানে কেতকী এসে বলে যে, সে অমিতের বাগদত্তা। অমিত তাকে বিয়ে করবো বলে আংটি পরিয়েছে। এখানে প্রেমের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এবং প্রেমের দিক পরিবর্তন হয়। তখন অমিত কেতকীকে বিবাহ করে, শোভনলাল লাবণ্যকে বিবাহ করে। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস দেখিয়েছেন।

চতুরঙ্গ :

এই উপন্যাসটি হল রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষায় লিখিত সর্বশেষ উপন্যাস। এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়। এই উপন্যাসটির চারটি অংশ—জ্যাঠামশাই, শচীশ, শ্রী বিলাস, দামিনী। জ্যাঠামশাইকে একজন সৎ আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এবং তার

ছত্রছায়ায় শচীশ শ্রী বিলাস মানুষ হয়েছে। শ্রী বিলাসের সর্বোত্তম বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক ছিল শচীশ। শচীশ পরে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে, লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। আর সেখানে দামিনীর সঙ্গে শচীশের দেখা। দামিনী শচীশ কে পেতে চেয়েছে, কিন্তু শচীশ অরূপরতনের সন্ধানী। সে আধ্যাত্মিক মানুষ তাই সে দামিনীর নারীত্বকে অস্বীকার করে। এমন ভাবে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পরে দামিনী শ্রী বিলাসকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে। এবং শ্রী বিলাসকে নিয়ে আক্ষেপ করে বলেছে—

"স্বাদ মিটিল না জন্মজন্মান্তর ধরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহের প্রচলন দেখিয়েছেন দামিনী চরিত্রের মধ্যদিয়ে। দামিনীর নারীত্বকে সর্বপেক্ষা উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই দামিনী চরিত্রই সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এক বিদ্রোহী নারী চরিত্র। সে স্বামীত্ব বরণ করলেও দাসীত্ব বরণ করেনি, এখানে চরিত্রটি মৌলিক হয়ে উঠেছে। তাই তার স্বামী শিবদোষের কথা না মেনে, গুরুর কথা না মেনে, নিজের মনের কথা শুনেছে। তাই দামিনী এখানে অতিসাহসী, জীবন সংগ্রামে প্রবাহিত দূরদর্শী ভাবনাময়ী নারীর প্রতিমূর্তি।

মালঞ্চ :

এই উপন্যাসটি নারী ও পুরুষের অন্তর মনের দ্বন্দ্ব ও স্ত্রীর শারীরিক দুর্বলতা, স্বামীর পূর্বকিছু ঋণের দায় রক্ষা, এক অসহায় করুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। আদিত্য ও নীরজা একটি ফুলের বাগান তৈরি করেছিল। এবং সুন্দর ভাবে তাদের সাংসারিক জীবন চলছিল। এমন সময় নীরজা অসুস্থ হয়ে পড়লে, আদিত্য তার দূর সম্পর্কের বোন সরলাকে নিয়ে আসে ঘর ও বাগান দেখাশোনা করার জন্য।

এখানে নারী মনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সরলার প্রতি নীরজার মনোভাব ভালো ছিল না, তাকে সহ্য করতে পারতো না। তার স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য ঔষধ না খাওয়ার বাহানা করেছে। কিন্তু অদৃষ্টের লেখা কেউ পাল্টাতে পারে না। নীরজা তাই রমেনের সঙ্গে সরলার বিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত পারেনি। তার সন্দেহ ঠিক হল। যখন বাড়ির পরিস্থিতি খারাপ হল তখন আদিত্য সরলাকে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করে। সরলা শিলমোহর চুরি দায়ে জেলে যায়, এবং সেখান থেকে সে পুনরায় আদিত্যের বাসায় ফিরে আসে। সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে নীরজার মৃত্যু হয়। এই ভাবে উপন্যাসের শেষ করা হয়েছে।

চোখের বালি :

এই উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের নরনারীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখব হরিমতি ও রাজলক্ষ্মী দুইজনে একই গ্রামের মেয়ে, একেই সঙ্গে বড় হয়েছে। তাই রাজলক্ষীর ইচ্ছা যে, হরিমতির মেয়েকে মহেন্দ্রের বৌ করে ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু মহেন্দ্র রাজি হলো না। পরে বিপিনের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ হয়। পরে সে বিধবা হয়।

মহেন্দ্রের কাকিমা অন্নপূর্ণা বিহারীকে তার বোনঝি কে বিবাহ করতে বলে। বিহারী তাতে রাজি হলেও দেখতে গিয়ে মহেন্দ্র বলে সে আশালতাকে বিবাহ করিবে। এখানে মহেন্দ্রের হীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সে আশালতাকে বিবাহ করেছে। পরে রাজলক্ষ্মী অভিমানে কাশী চলে যায়। সেখানে গিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হয়। এবং সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে আসে। যখন দেখল মহেন্দ্র আশালতার চেয়ে বিনোদিনী রূপে ও গুণে শ্রেষ্ঠ তখন বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানে বিনোদিনীর নারী মনের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে—

> “কী করিয়াছি। ভীরু কাপুরুষ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান
> ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝ হইতে আমাকে লোকের
> কাছে নষ্ট করিতেছ।”

এই রকম অকথ্য ভাষায় মহেন্দ্রের অপমান করে বিনোদিনী। বিনোদিনীর মনে দোলাচল মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে। কখনও মহেন্দ্র কে নিয়ে আবার কখনও বিহারীকে নিয়ে। তাই বিনোদিনী বিহারী বেলেছে—

> “ঐ টুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো
> পবিত্র হইয়ো না। মন্দ কে ভালোবাসিয়া একটু খানি মন্দ হও।”

এই রকম ভাবে মহেন্দ্রের সংসারে যে দাবানল লেগেছে, তাতে মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী, বিনোদিনী কেউ পার পাইনি। তাই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে বলেছে তুমি মর। তোমার জন্য আমার বৌ কাঁদছে, মা কাঁদছে। মহেন্দ্রের মনেও শান্তি নেই। তাই শেষে দেখি অন্নপূর্ণা র সঙ্গে বিনোদিনী কাশী যাত্রা করেছে। এবং পুনরায় আশালতা মহেন্দ্রকে স্বামী রূপে বরণ করেছে। এই ভাবে এই উপন্যাসে নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

উপসংহার

বঙ্কিম পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ একজন কালজয়ী ঔপন্যাসিক। তাঁর সৃষ্টিশীল ও মননশীল লেখার কাছে সমস্ত কিছু কেই দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয়গ্রাসী করে তুলেছেন। 'বউ ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমীচাল লক্ষ্য করা গেলেও, পরবর্তী উপন্যাস গুলিতে যেমন, 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়', 'চোখের বালি', 'গোরা' প্রায় সমগ্র উপন্যাসগুলিতে নিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'করুণা' উপন্যাস তাঁর প্রথম জীবনের লেখা। এটি তেমন পরিপক্ক হয়নি, তা ঔপন্যাসিক নিজেই স্বীকার করেছেন। এবং উপন্যাসগুলির বিষয় হিসাবে ঊন-বিংশ ও বিংশ শতকের কলকাতা নগরকেন্দ্রিক জীবনের বহু ঘটনা তাঁর উপন্যাসগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। এমনকি উপন্যাসগুলিতে মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, ভাতৃত্ববোধ, সহনশীল মনোভাব, ক্ষমা, করুণা, হিংসা, মনস্তত্ত্ব, মৃত্যু সমস্ত কিছু থাকলেও গবেষণা সন্দর্ভের মানশীলতা অনুযায়ী নারীমনের দ্বন্দ্ব ও বিন্যাসকে সাজিয়ে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, যোধপুরী, উদিপুরী, জেব উন্নিসা, দরিয়া বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বিন্যাসকে তুলে ধরা হয়েছে। আবার বিষবৃক্ষে সূর্যমুখী, কুন্দ, হীরা প্রভৃতি নারী মনের কথা, এছাড়াও কৃষ্ণকান্তের উইলে মানসিক টানাপড়েনের দৃশ্য ভ্রমর ও রোহিণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত প্রাক্ রবীন্দ্র-উপন্যাসে বিভিন্ন নারী মনের ভাবনা দেখি।

ঐতিহাসিককে পাই বউ ঠাকুরানীর হাটের বিভা, রুক্মিণী, সরমা। রাজর্ষিতে তেমন কোনো নারী দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়নি। পারিবারিক সামাজিকে পাই, ("আমি ভয় করি না।... যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতা নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কী করে?" কমলা যে কথাটি বলল, এটি কিন্তু নারীর প্রতিবাদের শব্দ। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এই কথার গুরুত্ব অনেক।) নৌকাডুবিতে কমলা ও হেমনলিনী দ্বন্দ্ব, যোগাযোগের কুমু, শ্যামা, নিস্তারিণীর কথা, দুইবোনে শর্মিলা ও উর্মির দ্বন্দ্ব, প্রজাপতির নির্বন্ধে জগত্তারিণী, পুর, শৈল, নীর ও নৃপবালার দ্বন্দ্ব। করুণাতে করুণা, রজনী, মোহিনী, নিধি নানান নারী দ্বন্দ্ব, চার অধ্যায়ে এলা, মায়াময়ী, মাধবী, চরিত্রের দ্বন্দ্ব। ঘরে বাইরে বিমলা, মেজোরাণী, বড়রাণীর কথা। মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস গোরাতে দেখি সুচরিতা, ললিতা, বরদাসুন্দরী, আনন্দময়ী, হরিমোহিনী, লাবণ্য, লীলা, ইত্যাদি নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস। রোমান্টিক উপন্যাস গুলিতে যেমন, শেষের কবিতাতে লাবণ্য, কেতকীর, চতুরঙ্গে দামিনী, মালঞ্চে নীরজা ও সরলার দ্বন্দ্ব। এবং ("ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা

মায়াবিনী।” বিনোদিনীর এই উত্তেজক শব্দ রাজলক্ষীর হৃদয়কে টুকরো টুকরো করেছে। এবং রাজলক্ষ্মীকে বুঝিয়ে দিয়েছে নারী দুর্বল না।) চোখের বালিতে পাই, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, আশালতা, বিনোদিনী প্রভৃতি নারী মনের দ্বন্দ্ব বিন্যাস।

সর্বশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র উপন্যাস গুলিতে স্বতন্ত্র, স্বাধীনচেতা, বিদ্রোহী, আধুনিকা, শিক্ষিতা, সাবলীল সুন্দর ও বুদ্ধিমতী নারীর জয়গান গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনায় তথাকথিত সমাজের মায়াজাল ছিন্ন করে, সমাজের বুক চিরে তাদের অধিকার ছিনিয়ে দিয়েছেন।

“মহকাল আমার পদতলে...
শায়িত চিরকাল
আমি ছাড়া এ জগৎ সংসার
সবই হবে অচল।”

গ্রন্থপঞ্জি

১) চোখের বালি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশান, কোলকাতা ৭০০০০৯।

২) রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ - ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়, পপুলার এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৬৭।

৩) চর অধ্যায় - শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩।

৪) গোরা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা ১৭।

৫) রাজর্ষি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা ১৭।

৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড) - সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯।

৭) বউ ঠাকুরানীর হাট - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা -১৭।

৮) ঘরে বাইরে ও রবীন্দ্রনাথ - ড. গোকুলানন্দ মিশ্র (সম্পাদক), গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা - ৭০০০০৯।

৯) বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) - কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা - ৭০০০০৯।

১০) কৃষ্ণকান্তের উইল - কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীন চন্দ্র পাল লেন, কলকাতা -৭০০০০৯।

১১) বিষবৃক্ষ : একটি পর্যালোচনা সম্পাদক - ড. রমনাথ আলি, সদ্-উ -তন, ৬ প্রকাশনী, মবারক আলি, মিঠাপুকুর, রাজবাটি, বর্ধমান।

১২) বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রজ্ঞাবিকাশ - ৭০০০৩৭।

১৩) রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র - ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা -৭৩।